বাংলাদেশে নতুন প্রাণের গান

একরামুল মোমেন

সমসাময়িক প্রতিবাদী গানের বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, এ গানগুলো কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তির অধীন নয়, বরং এ প্রজন্মের শিল্পীরা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক শক্তির অধীনে না থেকে জনগণের অংশ হিসেবে কথা বলে। এই লেখাটি সাম্প্রতিককালে প্রতিবাদী গানের যে ধারা রাজপথে অনুরণিত হচ্ছে, সেই গানগুলো নিয়ে, সেই শিল্পীদের কয়েকজনকে নিয়ে। তাঁদের ভাবনা-চিন্তা এখানে সংকলিত হয়েছে। তবে এই সংকলনের চেষ্টা অসমাপ্ত, অনেকের কণ্ঠস্বর এখানে বাদ পড়েছে। ভবিষ্যতে আরও লেখায় তাঁদের নিয়ে আলোচনা হবে।

বাংলার সর্বপ্রাচীন কীর্তি 'চর্যাপদ' থেকে শুরু করে সমসাময়িক সাহিত্য ও সংগীতের ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ গণসংগীত। সেই প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণত্বের বিপরীতে জাত-ধর্মের উর্ধ্বে গিয়ে কবি ভুসুকপা বলেছিলেন, 'আজি ভুসুকু তুই বাঙালী ভইলী'। সমাজের প্রতিষ্ঠিত শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর এই উচ্চারণ আজও স্মরণীয়। সে ধারায় পরবর্তীতে আমরা পেয়েছি কত শত জনমানুষের গান, যদিও তা সংখ্যায় খুব বহুল নয়। এই সময়ে সেরকম নতুন প্রাণের গানের শিল্পীদের কয়েকটি ধারা নিয়ে এই লেখা।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে পুঁজিবাদ বাজার দখল করে নিলেও কেউ কেউ গেয়ে চলেন জনতার গান। তথাকথিত সামাজিক নির্মাণের মাঝখানে হঠাৎ কোনো কণ্ঠে এখনও শোনা যায়, 'অগ্নিচেতনায় শান দাও'। এই কণ্ঠের দাবানল এত তীব্র, এফএম রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট বা সিডি-ডিভিডির সীমানা অতিক্রম করে এই গান পৌঁছে যায় সংবেদনশীল মানুষের হৃদয়ে, সেখানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবাই মানুষ। এদেশের বিচারহীনতার সংস্কৃতি, নিরাপত্তাহীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, নারীর অধস্তনতা, পুঁজিবাজারের আগ্রাসন ও শোষণের ভয়াল চিত্র বারবার ফুটে উঠেছে এইসব সর্বজনমুখী শিল্পীর কণ্ঠে।

কফিল আহমেদ : অগ্নিচেতনায় শান দাও

সমসাময়িক প্রতিবাদী গানের ধারায় প্রথমে বলতে হয় কফিল আহমেদের কথা। চুনারুঘাটের চা শ্রমিক থেকে শুরু করে পুড়ে যাওয়া গার্মেন্টস শ্রমিক, সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলন থেকে ফসলের মাঠ, তিনি এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। এ শতাব্দীর জন্য তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন নতুন এক ধারা। তাঁর গানের কথায় প্রজন্মের তরুণ খুঁজে পায় বুড়িগঙ্গার কথা, পাখাভাঙা এক পাখির কথা, ক্রীতদাসী মেয়ে ও ঘাড়ভাঙা ঘোড়ার কথা। তাঁর গানের গভীরে লুকিয়ে আছে রাষ্ট্রের দায়হীন স্বৈরাচার ও অন্ধ গায়কের কথা। তাঁর 'অগ্নিচেতনায় শান দাও' গানটি শুনে যন্ত্রসভ্যতায় হতাশ হয়ে যাওয়া তরুণটিও বাঁচার স্বপ্ন দেখে।

২৫ বছর ধরে দেশের নানা প্রান্তে আপোসহীন লড়াই করে চলছেন শিল্পী কফিল আহমেদ। প্রচলিত গণসংগীত কিংবা আধুনিক গানের প্রকরণ থেকে বের হয়ে তিনি বলেছেন অগ্নিচেতনার কথা। এই চেতনা পুড়িয়ে ছাই করে দেবে সব অন্যায়ের বাধা। বস্তুত জীবন ও শিল্পের সকল প্রকরণই তাঁর কাছে 'সোনার রাজার মতোই কুৎসিত'। কেননা কফিল আহমেদ আমাদের শোনান 'সাতটা শঙ্খ একবারে' বাজানোর কথা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করার পর প্রথাগত সরকারি চাকুরে না হয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন সংগ্রামমুখর জনতার শিল্পীর জীবন। যেখানেই শোষণ দেখেছেন, নিপীড়ন দেখেছেন, সেখানেই বেজে উঠেছে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর।

কফিল আহমেদের এই জনভাষার সূচনা হয় গৌতম ঘোষদের 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র সময় থেকে। একই পথ অনুসরণ করে গেছেন কলকাতার সুমন ও নচিকেতা। কিন্তু স্বভাবেই ভিন্ন কফিল আহমেদ। এই দেশে জলাধারের অধিকারের জন্য হাওরের জেলেদের লড়াই চলেছে। বঞ্চিত এই জনমানসের আকাঙ্ক্ষার সুর কফিলই ধারণ করেছেন। যে কারণে শহরের শিক্ষিত মানুষের চেয়ে কফিলের গান বেশি জনপ্রিয় হাওরের জেলে ও কৃষকদের কাছে। কৃষকের ব্যবধান পেরিয়ে গানগুলো সেতু রচনা করে সকল ধর্মের সব মানুষের। রাজনীতির চেয়ে এই গানে মুখ্য হয়ে ওঠে মানবতা। তাই এ গানের নামকরণ নির্দিষ্ট করা কঠিন। তাঁর গানের বুননটাও তাই অন্য রকম। অসহায় নদীর জন্য কফিল গেয়েছেন–

'বসি। একটু কাঁদি। ধুলার পাহাড়ে।
কাঁদলে কিরে ধুলার পাহাড়ে
গঙ্গাবুড়ি গঙ্গা বয়ে যাবে!'

কফিলের মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের সঙ্গী এবং একের জায়গায় অন্য অবলীলায় চলে আসে, গরু ও চাষার ব্যথা এক হয়ে যায়, শঙ্খ আর বন্ধুর মুখচ্ছবি মিলে যায়। তাদের কেউ শ্রেষ্ঠ বা অধীন নয়, তখন তারা হয়ে ওঠে সমান সমান।

কফিলের দুনিয়া কেবল মানুষকে কেন্দ্র করে ঘোরে না। তাঁর জগতে মানুষ, প্রাণী ও বৃক্ষের একই সংসার। এই মিলন প্রেম থেকে আসে না। কফিলের আঘাত এই অধিপতি ক্ষমতার মনোভাবে। কফিলের মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পরের সঙ্গী এবং একের জায়গায় অন্য অবলীলায় চলে আসে, গরু ও চাষার ব্যথা এক হয়ে যায়, শঙ্খ আর বন্ধুর মুখচ্ছবি মিলে যায়। তাদের কেউ শ্রেষ্ঠ বা অধীন নয়, তখন তারা হয়ে ওঠে সমান সমান। কফিল আহমেদ তাই গেয়ে ওঠেন–

'শঙ্খ যাইও বন্ধুর বাড়ি
শঙ্খ কইও তুমি তারই'

কফিলের গানে অভ্যাসমাফিক স্বস্তি নেই, শুনে অস্বস্তি হয়। মানুষ এরকম তীব্র হয় নাকি? সরলতায় গভীর হতে পারে নাকি? কফিল কোনো জটিল আবেগের দোষে ভোগেন না। জীবন নিয়ে চক্রে চক্রে ইনানো-বিনানো পাঁচালি গাওয়ার বাতিক তাঁর নেই। তিনি বাতিকমুক্ত শিশুর মতো সরল। আশা-নিরাশা, ক্রোধ-আনন্দ, প্রেম-ঘৃণা ও কান্না-চিৎকারের মতো মৌলিক কয়েকটি আবেগে গড়া তাঁর বিশ্ব, সেই বিশ্বের ভাবমণ্ডল। শত বিকার-বিপর্যয়ের পরও এগুলোতেই মানুষের

শেকড় পোঁতা, শত বছর পরেও এ-ই থাকবে মানুষের মৌলিক মুখচ্ছবি। এই সারল্যের সুনীতিই কফিলের রক্তে পালিত হয়, পূজিত হয় চৈতন্যের দরগায়। উল্লেখ্য, কফিলের রক্তের রঙের এইটুকু বেশি লাল, চৈতন্যের এইটুকু সুফি ভাব তাই আবার এক চরমপনার ইশারা করে।

সমগীত : তুমি, আমি মিলে আমরা

প্রথাগত গণসংগীত নয়, গানের মাধ্যমে সময়কে ধরার চেষ্টা করে সমগীত। কোনো ব্যান্ডদল নয়, নানামুখী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের সক্রিয় রেখেছে সৃজনশীল এই দলটি। আমরা জানি, সমগীতের অন্যতম কর্মী অমল আকাশ–এক নিঃশঙ্ক মুক্তকণ্ঠের মানুষ। প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ ব্যতিরেকে তাঁর শিল্পী পরিচয়টিও মুখ্য। তাঁর কণ্ঠে জীবনের যে সংকটগুলো চমৎকার সুরের বুননে ভেসে বেড়ায়, সংবেদনশীল মনকে তা স্পর্শ করবেই। কেবল শিল্পী নন, গীতিকার ও সুরকার হিসেবে তাঁর অনেক গান বিপ্লবী গানের ধারায় পাথেয় হয়ে থাকবে।

২০০২ সালের মে দিবসে নারায়ণগঞ্জ শহরে যাত্রা শুরু করে সমগীত। শুরু থেকেই গণমানুষের অধিকারের পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠ তোলে তারা। গানের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য স্কুল, বক্তৃতা বিষয়ক প্রকাশনা 'গঙ্গা ফড়িং', সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা 'ওঙ্কার' এবং চিত্রকলা বিষয়ক প্রকাশনা 'মানুষ' নিয়ে সমগীতের পথচলা। এই মুহূর্তে চিত্রকলা বিষয়ক প্রকাশনা 'মানুষ' বন্ধ থাকলেও নিয়মিত চলছে অন্যান্য কার্যক্রম। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জের পাশাপাশি ঢাকা, রাজশাহী এবং মুন্সীগঞ্জের লৌহজংয়ে প্রায় ২০০ জন কর্মী নিয়ে সমগীতের বিপুল কার্যক্রম। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগীতের একটি শাখা শুরু হলেও পরবর্তীতে বন্ধ হয়ে যায় এটি।

সমগীতের অন্যতম কণ্ঠশিল্পী রেবেকা নীলা বলেন, 'আমরা সমতার গানে বিশ্বাস করি। যূথবদ্ধ গানের আকর্ষণ থেকেই সমগীতের পথচলা শুরু। কারণ একসাথে গান গাওয়া, কোরাস আমাদের সংস্কৃতির বড় অংশ। সব মানুষকে এককাতারে নিয়ে আসতে পারে এর সুর।'

বিভিন্ন রাজনৈতিক সংকট এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার তাগিদ থেকেই সমগীতের পথচলা। শুরু থেকেই লেখক হুমায়ুন আজাদ হত্যা, লালন ভাস্কর্য ভাঙচুরসহ বিভিন্ন আন্দোলনে লড়াকু সৈনিকের ভূমিকা পালন করেছে সমগীত। যে কারণে সমষ্টির গান সমগীতের অন্যতম লক্ষ্য বলে মনে করেন তাঁরা।

২০০৮ সালে প্রকাশিত 'হাওয়া' অ্যালবামের গানগুলো দীর্ঘ আট বছরের পথচলার ফল। অ্যালবামের 'হাওয়া', 'ঘুম', 'বিলবোর্ড', 'গঙ্গাবুড়ি' গানগুলো সুরে যেমন মাতোয়ারা, তেমনি কথার গভীরতায় শ্রোতাদের অনুভব করায় এক বিপরীত সময়ের কথা। বিলবোর্ডের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মেঘের গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয় গল্প বলা দিদির কথা। মানবিক যে আবেগগুলো আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে পুঁজির আগ্রাসনে, যে সূর্যটা ঢেকে দিচ্ছে মস্ত বিলবোর্ড, তার দিকে তাকিয়ে শিল্পী প্রশ্ন ছুড়ে দেন–জানালার এতগুলো সীমা পেরিয়ে তোর কাছে কিভাবে যাব, দিদি?

এই সময়ের মানবিক গল্পগুলোই নতুন করে শ্রোতাদের শুনিয়েছেন সমগীত। ভীষণ ঘুম ভেঙে খোয়াবনামার সেই কথক রমিজ মিয়ার মতো সমগীত প্রতিবাদ করে বলে–

'ঘুম ভাঙে না
কাৎলাহারের বুকে চোরাবালিতে
তোমার আমার ঘুম ভাঙে না
তুমি জাগো না, আমি জাগি না
তুমি জাগো না, আমি জাগি না
আমরা জাগি না ॥'

সমগীতের গান আমাদের চেনা মিহি স্বরের ভাঁজে মজে না, বরং উস্কে দেয় শ্রোতাকে, প্ররোচনা দেয়। মুনাফা ভিত্তিক বাজারি মতাদর্শের বিপরীতে তাঁর পথচলা। সেখানে এক পাহাড়ি মেয়ের দৃপ্ত ভঙ্গিমা যেমন থাকে, তেমনি থাকে ক্রসফায়ারে নিহত যুবকের আর্তচিৎকার, প্যাকেজ ভালোবাসার প্রতি তীক্ষ্ণ শেষ।

সমগীতের গান আমাদের চেনা মিহি স্বরের ভাঁজে মজে না, বরং উস্কে দেয় শ্রোতাকে, প্ররোচনা দেয়। মুনাফা ভিত্তিক বাজারি মতাদর্শের বিপরীতে তাঁর পথচলা। সেখানে এক পাহাড়ি মেয়ের দৃপ্ত ভঙ্গিমা যেমন থাকে, তেমনি থাকে ক্রসফায়ারে নিহত যুবকের আর্তচিৎকার, প্যাকেজ ভালোবাসার প্রতি তীক্ষ্ণ শেষ।

অরূপ রাহী : প্রেম বলো, বলো ইতিহাস

অরূপ রাহী শুধু শিল্পী, গীতিকার, সংগ্রাহক বা সুরকারই নন, তিনি গানের একজন তাত্ত্বিকও। তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জনপদের ঐতিহ্যবাহী গান নিয়ে গবেষণা করেন, সেই সুরের সঙ্গে নিরীক্ষা করেন আধুনিক গানের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ও কলাকৌশলের। অরূপ রাহী বলতে আমরা বুঝি গানের দল লীলা। পশ্চিমা অর্থে আমরা যাকে ব্যান্ডদল বলি, লীলা কখনো নিজেকে সে রকম কোনো অবস্থান থেকে বিবেচনা করে না। এই মুহূর্তে গানের সীমানা পেরিয়ে তাদের কার্যক্রম ছড়িয়ে আছে গবেষণা, পাঠচক্র ও পত্রিকা প্রকাশ এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের মধ্যে।

রাহীর কণ্ঠে 'কাকে তুমি প্রেম বলো, বলো ইতিহাস' জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 'নায়ক' অ্যালবাম প্রকাশের পর।

অ্যালবামের এই নায়ক অতীতের রোমান্টিসিজম থেকে জন্ম নেয়া কোনো নায়ক নয়, বরং তার উত্থান হয় পুঁজিবাদ, পুরুষতন্ত্রের অভিজ্ঞতার ভেতর। তাই সে বলে–

'সামনে পেছনে থাকা সাদা পর্দা
তার বুক ছিঁড়ে তুমি নায়ক নায়ক'

এই নায়ক সমসাময়িক কালের এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা সমষ্টির নায়ক। অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে বর্তমানকে বুঝে ভবিষ্যতের রূপকল্প তৈরি করতে চায় এই নায়ক। তাই অরূপ রাহীর নায়ক কৃষক সভ্যতার নায়ক নয়, সে কৃষি সভ্যতার ইতিহাস জানে, সে দাসপ্রথার ইতিহাস জানে, সে আদিবাসী সমাজের উত্থানের ইতিহাস জানে, প্রতিরোধের ইতিহাস জানে; এসব অভিজ্ঞতা নিয়ে সে কথা বলে, কিন্তু সাথে সাথে বলে ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু দ্বিধা জাগে, পুরুষতন্ত্রের বাইরে এসেও এই নায়ক নিজেকে পরিচিত করাচ্ছেন নায়ক হিসেবে। শিল্পী বলছেন, 'এ নায়ক সহজাতের মুক্তির নায়ক। তার মধ্যে নারী বা পুরুষের আলাদা অস্তিত্ব নেই। সে মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের কথা বলে।'

পরবর্তী অ্যালবাম 'লোকায়ত' মূলত রাহীর একক অ্যালবাম। একই অ্যালবামে দুই রকমের গানই রেখেছেন তিনি। একদিকে 'মানুষ মেশিন' গানে আছে যন্ত্রসভ্যতাবিমুখ নাগরিক যন্ত্রণার কথা। 'খেলতে এসো' গানে রাহী বিপন্ন অস্তিত্বের লড়াই থেকে বলছেন–

'আমার অঙ্গ জুড়ে খেলছিলে সে প্রাণ

স্পন্দনে তার ছিলাম আমি জেগে
এখন তোমার খেলা বন্ধ যদি হয়
আমার মরণ বিনে গাইতে হবে গান
তুমি খেলতে এসো
তুমি খেলতে এসো'

অন্যদিকে 'মরার দেশে ভালো লাগে না' আধ্যাত্মিক ভাবজাগানিয়া হলেও সচেতনভাবে এক সামাজিক বলয়ের গান। রাহী তাঁর গবেষণা ও গায়কির মধ্য দিয়ে একটি নতুন ঘরানার গান নিয়ে হাজির হয়েছেন তাঁর পরবর্তী কাজে–'মেটাল জারি'। এখানে রাহী গাইছেন–

'রাজায় কইছে চুদির ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই
আঙ্কেল স্যামের চামচাগুলার লাজশরমের বালাই নাই।
রাজার পোষা বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজ নাম
রাজার বাণী জাবরকাটা তাগো কাম
সুশীল সমাজ কয় কী?
সুশীল সমাজ কয় কী? শোনো জনগণ
আমরা কিন্তু গরিব আছি, রাজা মেহেরবান।
রাজায় কইছে চুদির ভাই...'

এই গানের কথায় রাহী তাচ্ছিল্য করে বলছেন এই সমাজের প্রতিটি রন্ধ্রে লুকিয়ে থাকা সুবিধাভোগী মানুষের কথা। বর্তমান সময় ও সমাজের তোষামোদি চরিত্র সুর, লয় ও কথায় এতই তীক্ষ্ণ যে দ্রুতই রাজপথের তরুণের মন জয় করে নিয়েছে। তাজরীন অগ্নিকাণ্ডে নিহত শ্রমিকদের উদ্দেশে রাহী গেয়েছেন 'কয়লা হইয়া গেছে রে ময়না'। জারিগানের সুরে সুরে পুঁথিপাঠের মতো তাঁরা বলছেন এক সন্তান হারানো বঞ্চিত মায়ের কথা। কত অপেক্ষার পর এই সন্তানহারা মা হত্যার বিচার পাবেন, তা এখনো অজানা।

তাই নিজেকে তিনি বলছেন, 'গেরিলা বসন্তের আমি বনফুল'।

রাহী মনে করেন, 'সামগ্রিক শৃঙ্খলার সূত্র যেমন এক, মুক্তির সংগ্রামটাও এক। সে জায়গা থেকে নিজেদের লড়াইয়ে থাকার অভিজ্ঞতা, জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা আমরা গানের মাধ্যমে বলি। কিন্তু এটা তথাকথিত দায়বদ্ধতা থেকে নয়, প্রত্যেকের সংকট উত্তরণের জায়গা থেকেই আমাদের গান করা। বুর্জোয়া অর্থে যেটাকে কমিটমেন্ট বলে, সে অর্থে আমরা কমিটমেন্ট বিশ্বাস করি না। বরং এটাকে আমরা অঙ্গীকার বলতে পারি। কারণ এ দায়টা আমরা অঙ্গে ধারণ করি।'

তাই অরূপ রাহীর নায়ক কৃষক সভ্যতার নায়ক নয়, সে কৃষি সভ্যতার ইতিহাস জানে, সে দাসপ্রথার ইতিহাস জানে, সে আদিবাসী সমাজের উত্থানের ইতিহাস জানে, প্রতিরোধের ইতিহাস জানে; এসব অভিজ্ঞতা নিয়ে সে কথা বলে, কিন্তু সাথে সাথে বলে ভবিষ্যতের কথা।

আনুশেহ্ আনাদিল : রাই জাগো ভাই

১৯৯৮ সাল থেকে 'বাংলা' ব্যান্ডের জনপ্রিয় ভোকাল হিসেবে আনুশেহ্ আনাদিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। শুধু বাংলা ব্যান্ডের জন্য নয়, কণ্ঠের স্বকীয়তায় তাঁর গান ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। বাউল গান, কীর্তন, সহজিয়া দর্শন, লালন সাঁই ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী গানকে আনুশেহ্ এ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরেছেন নিজস্ব শৈলীতে। লোকগানের পথ ধরে তিনি বয়ান করেছেন এমন এক নারীবাদী পৃথিবীর কথা, যেখানে নারী একা জীবনসাগর পাড়ি দিতেও নির্ভয়। আনুশেহ্ তাই জোর গলায় বলেন–

'মনটা যে মোর বড্ড ভারী
কালা যে মন নিল কাড়ি
রাই জাগো ভাই, ভবসাগর আজ একলা হেসে দেব পাড়ি'

অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে তিনি জাগিয়ে তুলতে চান সেই আদিশক্তিকে, যেখানে নিজের শক্তিতে নারী নিজে গরীয়ান। এ কারণেই আনুশেহ্ বলছেন ফুল ঝরাবার কথা। 'রাই' অ্যালবামের 'সাবাশ মানুষ', 'রহস্য' যেমন বলছে আধুনিক মানুষ ও তার অগ্রগতির কথা, বিপরীতে তিনি তুলে ধরছেন মানুষের অমীমাসিংত অন্ধকারের কথা। বিশ্বযুদ্ধ, বোমার রাজনীতি আর বিবেকহীন সভ্যতা যেমন তাঁর গানে প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি রাধারূপ নারীর এক নতুন বয়ান সৃষ্টি হয়েছে অ্যালবামের প্রতিটি গানে। আনুশেহ্ ব্যঙ্গ করে বলছেন–

'মতোয়ালীর মতলব বুঝে দিও যে বেতন
তোমার টাকায় পাঠায় পোলা বিলাতে এখন
এলেম তালেম করেন যারা খাস তালেবান তারাই হয়'

আনুশেহ্ ধ্বংস নয়, দ্বিচারিতা নয়, মানুষের সৃষ্টিশীল সত্ত্বাকে জলে সিক্ত সবুজের মতো গড়ে তুলতে চান। শুধু মানুষ নয়, আনুশেহ্র এই সৃষ্টিশীলতা প্রকৃতিতেও গম্য। যে কারণে প্রকৃতির কাছে তিনি ফিরে যেতেন চান। মানুষ সভ্যতা আবিষ্কার করেছে, সঙ্গে এনেছে বোমা, গ্রেনেড আর পারমাণবিক অস্ত্র। পৃথিবীকে যতভাবে উচ্ছিষ্ট আবর্জনার মতো ব্যবহার করা যায়, সে করেছে। মানুষের এই ধ্বংসের উন্মত্ততায় দাঁড়িয়ে স্তব্ধ এক শিল্পী বলে ওঠেন–

'বুম বুম বুম বুম বুম...বোমা ফেলে পৃথিবী জয়
তোতাকাল মহাকাল তোর নেই ভয়
তুই ভি মুসাফির, অস্ত্রশস্ত্র বর্মধর্ম জাতপাত রক্তপাত
যা খুশি তা করে যাস
অমর মানুষ শাবাশ মানুষ
পৃথিবীটা চুষে খাস
শাবাশ...'

আমরা লক্ষ করি, সুবিধাবাদী শিল্পীসমাজ যখন ক্ষমতার সাথে মানিয়ে চলে তখন সে উল্টো রথে চলে। তাঁর গানের কথায় ভয় নেই, লুকানোর প্রবণতাও নেই। শিশু যেমন নির্দ্বিধায় বলে যায় তার চাওয়া-পাওয়া, ভালো লাগার কথা, আনুশেহ্ও তেমনি বলে গেছেন এই দেশ ও রাজনীতির প্রতি তাঁর চাওয়া-পাওয়া ও যৌক্তিক দাবির কথা। র‍্যাপ, ফিউশন ও মৌলিক গানের সুরে আনুশেহ্ নিজের গানের ভুবন সৃষ্টি করলেও তাঁর গানের কথা আকাশ সংস্কৃতি ও পুঁজিবাদী চিন্তাধারার বাইরে। তাঁর গানে মানুষের দ্বিচারিতা যেমন হোঁচট খেয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা প্রকাশ্যে ফুটে উঠেছে–

'নৌকাতে যে ঘুণ ধইরাছে, ধানের শীষে পোকা,
লাঙ্গলেতে জং সেই কবে, (দেইখা) বাম দিকে সব বোকা,
দাঁড়িপাল্লার দাড়ির জটে মাটির 'পরে লাশ
এই মাটিতে দেব-দেবতা আইসাই যে খায় বাঁশ!'

শুধুমাত্র শিল্পী হিসেবেই নয়, একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবেও নিজের অবস্থান সৃষ্টি করেছেন আনুশেহ্। তাঁর পরবর্তী গানের অ্যালবাম প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠান 'যাত্রা'র ব্যানারে। এর পাশাপাশি 'যাত্রাবিরতি'র বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের শিল্পীদের জন্য গড়ে তুলেছেন নিজস্ব তহবিল। বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন শিল্পীরা নিয়মিত অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকেন এখানে।

নিজের এই পথচলা নিয়ে আনুশেহ্ বলেন, 'গান আমার কাছে ভালোলাগা বা বিনোদনের উপকরণ নয়, এটি এক ধরনের সমগ্র জীবনবোধ। এই বোধকে বাঁচিয়ে রাখতে সৃষ্টিশীল চিন্তা যেমন দরকার, তেমনি দরকার নিজের সংস্কৃতি ও দেশকাল নিয়ে জানাশোনা। বাংলা সংস্কৃতির শেকড় অনুসন্ধানের পথ ধরেই আমার সংগীতের যাত্রা। কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলাদেশ নিয়ে আমি হতাশ। এ অবস্থা থেকে আমাদের উত্তরণ জরুরি।'

পদ্ম : রাজা যায় রাজা আসে

এ যুগের তরুণ শিল্পীদের মধ্যে 'পদ্ম' জনপ্রিয়তা পেয়েছেন বিপ্লবী গান গেয়ে। প্রথাগতভাবে গান শিখে নয়, গানের মাধ্যমে মানুষের কথা বলবেন বলেই পদ্ম হাতে তুলে নিয়েছিলেন মন্দিরা। তাঁর কণ্ঠে 'রাজা যায় রাজা আসে', 'এখন ভাঙচুরের সময়', 'মায়ানদীর বাঁকে' গানগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় সবার পরিচিত। গানগুলো যে শুধু বিপ্লবের কথা বলে এমন নয়, বরং যাপিত জীবন ও সময়কে গানের কথায় স্পষ্ট করে তুলতে চান পদ্ম। তাঁর গানে হতাশা, স্বপ্নভঙ্গ ও পরাধীনতার পথ পেরিয়ে আছে মুক্তির আশ্বাস। মুক্তির সন্ধানে প্রয়োজনে খুঁজে নেন ভালোবাসার গান।

> অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে তিনি জাগিয়ে তুলতে চান সেই আদিশক্তিকে, যেখানে নিজের শক্তিতে নারী নিজে গরীয়ান। এ কারণেই আনুশেহ্ বলছেন ফুল ঝরাবার কথা।

পদ্মর হাত ধরেই 'চিৎকার' ব্যান্ডদলের পথচলা। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাদের নতুন গান 'হাতে হাতে'। এটি শ্রমিক শ্রেণী ও শাসকের জাঁতাকলে পিষ্ট আপামর জনসাধারণের গান। এ প্রসঙ্গে পদ্ম বলেন, 'এখনও এদেশে গণতন্ত্রের নামে রাজতন্ত্র চলছে। তাই এ গানটির মূলে রয়েছে রাষ্ট্রের অসংগতি। কারণ এখানে কেবল ক্ষমতা বদল হয়, কিন্তু জনতার ভাগ্য পাল্টায় না। রাষ্ট্রের কাছে মানুষগুলো যেন ভেড়ার পালের মতো। তারা সবাই কনফিউজড। ট্রাম্প বা আইএস সবারই চেহারা এক। অথচ রাষ্ট্র ও মিডিয়া কখনও প্রকাশ্যে এসব বলে না। এখানে সবকিছুই কেবল খবর হয়ে যায়। নেপথ্যের এই না-বলা কথাগুলোই গানের কথায় বলা।'

পদ্ম গানে গানে স্বপ্ন দেখেন, মানুষগুলো আর ডাস্টবিনে পচে নষ্ট হবে না, অন্ধকার বারবার এদেশে ফিরে আসবে না। জীবনবোধে বিলীন হয়ে জেগে থাকার স্বপ্নগুলো তুলে আনবে তারা। নিজেকে অবরুদ্ধ নয়, প্রকাশ করবে নিজের কথায়। সে কণ্ঠই হবে অপমানিত লাখো মানুষের বঞ্চিত কণ্ঠস্বর। তবে তারও আগে জাগতে হবে নিজেকে। পদ্মর বিশ্বাস, বিচ্ছিন্নতা একদিন হারিয়ে যাবে, শোকগুলো একসময় শক্তি হয়ে দাঁড়াবে। হতাশার শক্তি থেকেই বাজবে এ সময়ের স্পন্দন।

মাদল : কর্ণফুলীর কান্না

২০০৯ সালের নভেম্বরে বিভিন্ন ভাষাভাষী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের ছাত্ররা একসাথে গড়ে তোলেন 'মাদল'। আদিবাসী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, ছাত্র ফেডারেশন, গারো সংগঠন চানচিয়াসহ বিভিন্ন সংগঠনের সাহায্যে ক্রমেই তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে। প্রথমে বৃহত্তর রাজশাহীতে, পরে উত্তরবঙ্গ, ঢাকা, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে গান পরিবেশন করেন তাঁরা। প্রান্তিক এই গানের দলে বর্তমানে কাজ করছেন শ্যাম সাগর মানখিন (প্রধান কণ্ঠশিল্পী), হরেন্দ্রনাথ সিং (মাদল), রিটন চাকমা (গিটার), জেনসন আমলাই (লিড গিটার), অন্তর স্কু (বেইস গিটার), সায়ন মাংসাং (আড়বাঁশি), আন্থনী রেমা (ড্রাম, কাজন ও বঙ্গো) এবং যোয়েল চাকমা (ফটোগ্রাফি)।

> পদ্ম গানে গানে স্বপ্ন দেখেন, মানুষগুলো আর ডাস্টবিনে পচে নষ্ট হবে না, অন্ধকার বারবার এদেশে ফিরে আসবে না। জীবনবোধে বিলীন হয়ে জেগে থাকার স্বপ্নগুলো তুলে আনবে তাঁরা। নিজেকে অবরুদ্ধ নয়, প্রকাশ করবে নিজের কথায়।

'বাহারি কন্যা', 'কর্ণফুলীর কান্না', 'মধুপুরে মিশে গেছে', 'চলেশ রিছিলের তাজা রক্তে'–এমনই শাণিত কথা আর সুরে পাহাড় থেকে সমতলে ছুটে বেড়াচ্ছে 'মাদল'। যেখানেই জুলুম চলে, সেখানেই সংগ্রামী গণসংগীত নিয়ে হাজির হয় ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর এই গানের তরুণরা। 'জেগে উঠুক মানবতার জয়গান'–এই আহ্বানে তাঁদের পথচলা। ব্যান্ডদলের সদস্য যোয়েল চাকমা বলেন, 'মানুষের নিভৃত বেদনা, চাওয়া-পাওয়া নিয়ে আমাদের গান। দলের সদস্যরা একেক জায়গায় থাকলেও প্রতি মাসে এক হই আমরা। গানের মাধ্যমে অবহেলিত নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়কে আমরা নতুন দিনের স্বপ্ন দেখাতে চাই।'

অভিনব এই গানের দলে রয়েছেন ভিন্ন ভাষাভাষী চাকমা, গারো, মারমা, বম ও সিং জাতিগোষ্ঠীর শিল্পীরা। বাংলা ভাষার পাশাপাশি তাঁরা নিজস্ব জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী গানও পরিবেশন করেন। মাদলের শিল্পীরা এখন উদ্যোগ নিয়েছেন হারিয়ে যেতে বসা আদি সুরের গানগুলো সংগ্রহ করার। পরে তাঁরা এগুলো আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে নতুন করে পরিবেশন করবেন। বলা ভালো, দেশে এ ধরনের গানের দল এটিই প্রথম। তবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে নিজ নিজ ভাষার অসংখ্য গানের দল। এই মুহূর্তে চলছে তাদের প্রথম অ্যালবামের কাজ। মাদলের মৌলিক আটটি গান নিয়ে এটি প্রকাশিত হবে চলতি বছরের শেষে।

বেতাল : সুন্দরবনের বুদবুদ

কখনও বাসে কিংবা ট্রেনের ছাদে 'বেতাল' নামের একটি ব্যান্ডদল প্রায়ই দেখা যায়। কোনো উপলক্ষ বা আয়োজনের অপেক্ষায় নয়, যে কোনো জাতীয় সংকটে তারা পথে নেমে আসে। গৎবাঁধা কনসার্টের বদলে তাঁরা নিজেদের কথা বলে যে কোনো স্থানে। সর্বপ্রথম রাজধানী ঢাকার পরীবাগে সুন্দরবন ও সুন্দর মন রক্ষার দাবিতে তাদের দল বেঁধে গান গাওয়া শুরু। সেই থেকে বেতালের পথচলা।

'তুই কয়লা দিয়া গোসল কর
কয়লা দিয়া নাশতা কর
সুন্দরবন ধ্বংস করে
বিজলি দেখানোর কি দরকার'

এই গানটি সুন্দরবন আন্দোলনের রাজপথে ছোট-বড় সকলের মুখে মুখে ফেরে। জানা যায়, 'বেতাল' নামের একটি গান থেকে এই ব্যান্ডদলের নামকরণ। অবশ্য ব্যান্ডদল বলতে যা বোঝায় বেতাল ঠিক তা নয়। নিজেদের গানের দল বলতেই তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

বেতাল মনে করে, পৃথিবীর সবাই তাদের সদস্য। যে কেউ তাদের সঙ্গে গানে অংশ নিতে পারে। কোনো কনসার্ট বা অ্যালবামের অপেক্ষা না করে তারা গান গায় পথে পথে, মাঠেঘাটে, এমনকি বাস বা চলন্ত ট্রেনের ছাদে। যোয়েল, তপু, লীনা, নোঙ্গর, বাবু, মামুন, সাগর, লাবণ্য ও কুয়াশা এই দলের নিয়মিত সদস্য। কখনও খালি গলায়, কখনও বা

ঢোল- করতালসহ তাঁরা গানে গানে বলেন এই সময়ের মানুষের কথা।

বেতাল জানায়, এরই মধ্যে বাংলাদেশের চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, দিনাজপুরসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় গান পরিবেশন করেছে তাঁরা। বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার সব থানায় গান নিয়ে পৌঁছতে পারবে বলে আশা করছে তাঁরা। তবে অ্যালবাম নিয়ে কোনো ভাবনা নেই তাদের। কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার মধ্যে তাঁরা যেতে চায় না। গানের পাশাপাশি পারফর্মিং আর্ট নিয়েও আগ্রহী এই দলের সদস্যরা।

তাঁদের গানের কথাগুলো লেখেন ভোকালিস্ট তপু। বেতাল নিয়ে তিনি বলেন, 'ছোটবেলা থেকে দেখেছি, গান মূলত পরিবেশনামূলক শিল্প। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গান না শিখলেও গানের প্রতি টান থেকেই আমাদের এক হওয়া। গান গাইতে গিয়ে অনেক অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছি। অনেকের ভালোবাসা পেয়েছি, অনেক রকম সাহায্য পেয়েছি। আবার অবহেলার নজিরও আছে। তবে গান গাওয়া আমরা থামিয়ে দিইনি।'

বেতালের গানের কথা লেখা হয় বিভিন্নভাবে। কখনও একক প্রচেষ্টায় অথবা সকলের সঙ্গে বসে। সুর করার ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। বেতালের উল্লেখযোগ্য গানগুলো হলো–'কয়লা দিয়া গোসল কর', 'দেশে কোনো আইন নাই', 'চলেন ফুটপাতে ঘুমাই', 'বাগানের পায়ে পায়ে দেশান্তরির কথা', 'সুন্দরবনের বুদবুদ', 'পুলিশ মামা পুলিশ মামা'। তবে গানের প্রথাগত সংরক্ষণ বা সংগ্রহের প্রয়োজন এখনও বোধ করে না তারা। রেকর্ডিং বা অ্যালবাম প্রকাশের মধ্য দিয়ে গান সংরক্ষণ করার কথা তাঁরা ভাবে না। বরং মানুষের মুখে মুখে গানগুলো ছড়িয়ে দিতে চায় তাঁরা। যে গান মানুষের মনে দাগ কাটেনি, তা হারিয়ে যাবে, তাকে সংরক্ষণ করার তাগিদ বোধ করে না।

বাজারের নয়, সর্বজনের গান

এই সময়ে একক ও দলীয় চেষ্টায় অনেক তরুণ গানের জগতে নতুন প্রাণ উপস্থিত করেছেন। তাঁদের মেধা ও অঙ্গীকার, কথা ও সুর এবং উপস্থাপনায় সর্বোপরি তাঁদের সৃষ্টিতে, জনসমুদ্রের ভেতর থেকে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শৃঙ্খলমুক্তির আকাঙ্ক্ষার সরব প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। কিন্তু প্রতিবাদী গানের এই নতুন সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটেনি। বিশেষ করে গানও যেখানে বিনোদনমূলক পণ্য, বাজারের বিকাশের সাথে যখন গানের বিকাশ ও প্রসারকে সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে, তখন এই প্রতিবাদী গানের ধারাটা কিভাবে গড়ে উঠল? এ প্রসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি ও বিপ্লবী গানের ধারা নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদের সাথে কথা বলছিলাম : "প্রতুলের 'আমি বাংলায় গান গাই' এখন বিজ্ঞাপনের গান। শুধু এটাই নয়, 'জাগরণের গান' নামের প্যাকেজে অনেক সংগ্রামী গান এখন মোবাইল কোম্পানির বিজ্ঞাপনী প্রকল্পের অংশ। শুধু গানও নয়, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার, শহীদ মুক্তিযোদ্ধার চিঠি, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, নারীর লড়াই, শিশুর স্বপ্ন ও লড়াই, দারিদ্র্যপীড়িত শিল্পী, সংগঠক–সবাই সবকিছু এখন বিজ্ঞাপনের মডেল। সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী অনেক কণ্ঠশিল্পী, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার এখন উৎকৃষ্ট মানের বিজ্ঞাপন রচনায় ব্যস্ত। অনেক মেধাবী তরুণ এখন কিছু টাকার বিনিময়ে কিংবা ক্যারিয়ার গড়ার আশায় বিজ্ঞাপন অর্থাৎ মিথ্যাচার ও প্রতারণার মাধ্যমে জনগণের মাথা গুলিয়ে কতিপয় কোম্পানির মুনাফা বাড়াতে ব্যস্ত। আর তা করতে গিয়ে জনগণের দীর্ঘদিনের রক্তমাখা স্মারক গান আর প্রতিষ্ঠানকে মডেল বানাতেও তাঁদের দ্বিধা হচ্ছে না। এটাই তাঁদের সফল ক্যারিয়ারের শীর্ষবিন্দু।"

স্পন্সরশিপের জাল ক্রমেই শিল্প-সংস্কৃতির জগৎকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে। এখন নাট্য উৎসব, সংগীত উৎসব, স্বাধীনতার গান, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, মে দিবস–সবকিছু হয়ে উঠছে গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, ওয়ারিদ, রবি, বা কোনো হাউজিং সোসাইটির প্রচারণা কর্মসূচির বাহন। শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মীদের অনেকে সন্তুষ্ট চিত্তে নিজেদের বিলিয়ে দিচ্ছেন পুঁজির পদতলে।

এ রকম একটি আগ্রাসনের কালেও মানুষ তো আর অদৃশ্য হয়ে যায়নি। তাই লড়াইও থেমে যায়নি। মানুষ যদি থাকে, তাঁর চেতনা যদি থাকে, তাহলে তাঁর লড়াইয়ের ভাষাও নানাভাবে নির্মিত হতে থাকে। সে কারণে গত এক দশকে বাংলাদেশে নিপীড়ন, আধিপত্য, দখল ও বৈষম্য বিরোধী অনেকগুলো লড়াই-সংগ্রাম দৃশ্যমান হয়েছে। এই সংগ্রামের জমিনেই জন্ম নিয়েছে নতুন প্রাণের গান ও গানের দল।

এই শিল্পীদের জীবন অন্য সাধারণ শিল্পীদের মতো নয়। এঁরা শিল্পীজগৎ থেকেই আবির্ভূত হন। কিন্তু মানুষের জীবন ও লড়াইয়ের প্রতি তাঁদের তীব্র সংবেদনশীলতা তাঁদেরকে সাধারণ ব্যক্তিক তৃপ্তিতে ডুবে থাকা চরিত্রের শিল্পী থেকে অন্য এক মানুষে রূপান্তর করে। নন্দনতাত্ত্বিক সুখ নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, যদিও নন্দনতত্ত্বের পরীক্ষায় তাঁদেরও উত্তীর্ণ হতে হয়। আর শিল্পে ব্যক্তিক সাফল্য, প্রতিষ্ঠা, যশ তাঁদের আরাধ্য নয়, সমষ্টির লড়াইয়ে নিজের সক্ষমতা যোগ করে তাঁকেও নিতে হয় জীবনের ঝুঁকি। জীবনের সাফল্যের প্রচলিত ঘেরাটোপ থেকে বের হয়ে তৃপ্তি আর সাফল্যের নতুন সংজ্ঞা তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। সেখানে নিশ্চিত জীবনের বদলে থাকে অনটন, থাকে জেল-জুলুম সবকিছুরই সম্ভাবনা।

একরামুল মোমেন: নৃত্যশিল্পী ও সাংবাদিক
ইমেইল: akramulmomen@gmail.com

সংগৃহীত